□

২৫.০ উদ্দেশ্য

২৫.১ প্রস্তাবনা

২৫.২ রাজনৈতিক যোগাযোগ

২৫.২.১ রাজনৈতিক যোগাযোগের সংজ্ঞা

২৫.২.২ বিষয়টির উদ্ভব ও বিকাশ

২৫.২.৩ সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা

২৫.৩ রাজনৈতিক যোগাযোগের মূল উপাদান

২৫.৩.১ যোগাযোগের কাঠামো ঃ প্রকৃতি ও গুরুত্ব

২৫.৩.২ যোগাযোগের প্রক্রিয়া ঃ রাজনৈতিক গতিশীলতা

২৫.৩.৩ ব্যবস্থার সক্ষমতা

২৫.৩.৪ রূপান্তর ক্রিয়া

২৫.৪ প্রযুক্তি বিপ্লব ও রাজনৈতিক যোগাযোগ

২৫.৫ উপসংহার

২৫.৬ অনুশীলনী

২৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককের নিম্নলিখিত অংশে আপনি যা জানতে পারবেন—

- যোগাযোগ কেন রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি।
- ‘রাজনৈতিক’ ও ‘যোগাযোগ’-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা; রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য।
- গ্রীকযুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত রাজনৈতিক যোগাযোগের উদ্ভব ও বিকাশে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট; রাজনৈতিক যোগাযোগের অতিসরল ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা।
- রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার কাঠামোগত প্রেক্ষিত।
- যোগাযোগ প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক গতিশীলতা।
- প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রবল অগ্রগতি।

প্রস্তাবনা

এই পর্যায়ে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় রাজনৈতিক যোগাযোগ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিতে সক্রিয় গোষ্ঠী। এই বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার জন্য যে প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন, এখানে তা বর্ণনা করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব অবশ্যই এমন এক বিষয় বা রাজনীতি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্মোচনের দিকে নজর দেয়; তবে এই নজরেরও এক বৈশিষ্ট্য আছে। মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ভিত্তি হল **বৈধ ক্ষমতা**। নিছক ক্ষমতার সঙ্গে বৈধ ক্ষমতার পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। নিছক ক্ষমতার পরিধি কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে **প্রভুত্ব (domination)**; এক্ষেত্রে যাদের ওপর প্রভুত্ব করা হয় তাদের ভূমিকা থাকে গৌণ। অন্যদিকে বৈধ ক্ষমতার পরিধিতে শাসিতের গুরুত্ব যথেষ্ট। এই গুরুত্বের কথা মনে রেখে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে তত্ত্বায়ণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে থাকে 'ক্ষমতা' (power) ও প্রভুত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের প্রয়াস। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স হেবার (Max Weber)-এর অবদান বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। বলা যেতে পারে 'ক্ষমতা', 'প্রভুত্ব' ও 'কর্তৃত্ব' (authority)-র প্রকৃতিগত ভিন্নতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে তিনি রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও অগ্রগতি সম্ভব করে তোলেন। পরবর্তী কালে তাঁর উপযুক্ত উত্তরসূরীগণ এই বিষয়ের বিস্তৃতিতে যথেষ্ট অবদান রাখেন।

ক্ষমতার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এ কারণেই রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের আলোচনায় রাষ্ট্র-ক্ষমতাকে প্রভাবিত করা এবং ঐ ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অধিকার করার গুরুত্ব অসীম। রাষ্ট্রের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হেবার নিজেই উল্লেখ করেছেন রাষ্ট্রের এক বৈশিষ্ট্যের কথা ঃ রাষ্ট্র এমন এক সংগঠন যা শারীরিক বল প্রয়োগের অধিকারকে বৈধভাবে নিজের আয়ত্তাধীন রাখে ("The State is an institution that legitimately monopolises the means of physical coercion")।

সংক্ষেপে বলা চলে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের মূল প্রেক্ষিত দুটি ঃ (১) ক্ষমতার প্রেক্ষিত--কীভাবে অন্যকে/অন্যদের নিজের ইচ্ছাধীন করে রাখা যায়; (২) কর্তৃত্বের প্রেক্ষিত--কীভাবে এই ক্ষমতার প্রতি সম্ভাব্য গ্রহীতাদের স¥œতি নিশ্চিত করা যায়। আমরা যখন আমাদের মূল বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করব তখন এই দুই প্রেক্ষিতের প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ স্পষ্ট হবে।

যোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যতীত মানব জীবন ও সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আমাদের চেতনা, অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্ত সহ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানবসভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রগতির মূল চাবিকাঠিও এই যোগাযোগ। আমাদের জীবনের যোগাযোগের এই গুরুত্বের নিরিখেই বলা যায় যে রাজনৈতিক যোগাযোগ ব্যতীত রাজনৈতিক ব্যবস্থা পূর্ণতা লাভ করে না। আসলে রাজনীতির মূলেই আছে এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্য ও মতামত আদান-প্রদান করা হয়।

আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব, এই শতাব্দীতে রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া তত্ত্বায়ণ ও বাস্তবে ক্রমশ পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটি বিষয়ই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে ঃ **যোগাযোগই রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি**। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কার্ল ডয়েশ (Karl Deutsch) তাঁর Nerves of Government নামক গ্রন্থের শুরুতেই বলেন, রাজনীতি ব্যাখ্যার কেন্দ্রমূলে রয়েছে যোগাযোগ বা প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের দাবী।

রাজনীতির ভিত্তিতেই আছে কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে--তা যে-কোনো অঞ্চলই হোক বা গোষ্ঠীই হোক বা রাষ্ট্র ও সমাজের মতো বৃহৎ সংগঠনই হোক--সংশ্লিষ্ট সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক গঠন যে, যৌথতার চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তার মূলেই আছে যোগাযোগ। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের মূল তিনটি ক্ষেত্রে নজর দিলে দেখা যায় প্রতিটির মধ্যেই সম্পৃক্ত হয়ে আছে যোগাযোগ প্রক্রিয়া ঃ

(১) **রাজনৈতিক বিন্যাসের সামাজিক ভিত্তি (Social foundation of political order)**—এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেভাবে সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

(২) **রাজনৈতিক আচরণের সামাজিক ভিত্তি (Social base of political behaviour)**—এক্ষেত্রে নির্বাচন, রাজনৈতিক মতামত, রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যপদ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ বা সমর্থনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৩) **রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সামাজিক প্রেক্ষিত (Social dimensions of political process)**—এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতি ও অস্থিরতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

তবে রাজনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্ব সন্দেহাতীত হলেও এই প্রক্রিয়ার সংজ্ঞার বিষয় বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আমরা রাজনৈতিক যোগাযোগের **সাধারণ** (general) ও **নির্দিষ্ট** (specific) **সংজ্ঞা** উল্লেখ করতে পারি।

২৫.২.১ রাজনৈতিক যোগাযোগের সংজ্ঞা

'রাজনৈতিক' ও 'যোগাযোগ' এই দুই ধারণাকেই বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব। ব্যাপকার্থে 'যোগাযোগ'-এর অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে তথ্য, বক্তব্য, সংকেত এবং প্রতীকের আদান-প্রদান ব্যাপকার্থে রাজনীতি এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধমে বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে **ইচ্ছাকৃতভাবে** পরিবর্তন আনা যায়। এই সূত্রে বলা যায়, রাজনৈতিক যোগাযোগ এক বিশেষ প্রক্রিয়া যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছাকৃত ও প্রণোদিত কার্যকলাপ অঙ্গীভূত। রাজনৈতিক যোগাযোগের এই সাধারণ সংজ্ঞার পরিধি স্বাভাবিকভাবেই বিস্তৃত। এক্ষেত্রে কোনও এক নির্বাচন প্রার্থীর বক্তৃতা বা এক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের আলোচনা, এমনকি কোনও এক সংগঠনের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর লিখিত নির্দেশও রাজনৈতিক যোগাযোগের আওতাভুক্ত।

অন্যদিকে রাজনৈতিক যোগাযোগের নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় তা এমন এক প্রক্রিয়া যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশেষ প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্র সরকার সংক্রান্ত নানা তথ্য। ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভাবন ও প্রেরণ। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের কয়েকটি গবেষণামূলক কাজের উল্লেখ করে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। হ্যারল্ড লাসওয়েল (Harold Lasswell) তাঁর Propaganda Technique in the World War (১৯২৭) গ্রন্থে রেডিও ও লিফলেট বণ্টনের মাধ্যমে যে 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' ব্যাখ্যা করেছেন তা রাজনৈতিক যোগাযোগের নির্দিষ্ট সংজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে টেলিভিশন, পোস্টার ও বক্তৃতা, ভূমিকা ও আইন বিভাগ উদ্ভূত যোগাযোগ প্রক্রিয়া সৃষ্টিতে বিভিন্ন কমিটির প্রতিবেদন এবং সংসদীয় বক্তৃতা রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণে সাহায্য করে। যদিও এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন, উইলবার স্ক্র্যাম (Wilbur Schramm) ও সমমনোভাবাপন্ন বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে কয়েকটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তি অনেক বেশি। তাদের মতে, এই সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যার ফলে ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে যে এই তথ্য সম্প্রচার ক্ষমতাযুক্ত এই বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরে রাজনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্ব কমে যায়।

উপরোক্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক যোগাযোগের এক বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ঃ রাজনৈতিক যোগাযোগ এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন তথ্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার এক অংশ থেকে অন্য অংশে প্রেরিত হয়; এক্ষেত্রে সমাজের প্রতিটি স্তরে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান ঘটে থাকে।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদরা এ বিষয়ে একমত যে রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার দুটি মূল উদ্দেশ্য হল তথ্য প্রদান (twin form) ও **প্রত্যয় উৎপাদনের চেষ্টা** (persuasion)। এক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হল ঃ **কে বা কারা পরিবর্তন ঘটাচ্ছে? কার/কাদের পরিবর্তন হচ্ছে? কেন এই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হচ্ছে?**

২৫.২.২ বিষয়টির উদ্ভব ও বিকাশ

রাজনৈতিক যোগাযোগের বিশ্লেষণ প্রধানত রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের আওতাভুক্ত হলেও এই বিশ্লেষণের সূত্র রয়েছে কয়েকজন মহান দার্শনিকের চিন্তাভাবনায়। এক্ষেত্রে প্লেটো (Plato)-র **Gorgius,** এ্যারিস্টটল (Aristotle)-এর **Rhetoric,** জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)-এর **System of Logic** ও ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli)-এর **The Prince** উল্লেখযোগ্য। প্লেটো তাঁর ঐ গ্রন্থে প্রচার (propaganda)-এর নৈতিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ্যারিস্টটল ও মিলের উদ্দেশ্য ছিল উৎস হিসেবে বিতর্কের কাঠামোগত রূপ আলোচনা করা।

Rhetoric গ্রন্থে এ্যারিস্টটল প্রত্যয় উৎপাদনের তিনটি কারণ উল্লেখ করেন। প্রথম, বক্তার ব্যক্তিগত চরিত্র ঃ দ্বিতীয়, 'গ্রহীতা'র (audience) একটি বিশেষ মানসিক অবস্থা; তৃতীয়, বক্তার বক্তব্যের প্রখরতা। এ্যারিস্টটল আরও উল্লেখ করেন, সার্থকভাবে এই প্রত্যয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে বক্তার যুক্তিবোধ প্রখর হতে হবে ও এর সঙ্গে থাকতে হবে মানুষের আবেগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, পরবর্তী কালে মার্কস (Marx)-এর

German Ideology বা সোরেল (Sorel)-এর Reflection on Violence বা লেনিন (Lenin)-এর What is to be Done বা প্যারেটো (Pareto)-এর The Mind and Society রাজনৈতিক যোগাযোগের ঐ বিশেষ দার্শনিক ঐতিহ্যেরই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন।

বিংশ শতাব্দীতেই রাজনৈতিক যোগাযোগ ও এই প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রত্যয় উৎপাদনের চেষ্টা রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পায়। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে উদ্ভাবিত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের (representative democracy)-এর উদ্ভব ও ক্রমবর্ধমান প্রভাবের যোগ লক্ষ্য করা যায়। তবে বিংশ শতাব্দীতেই জনগণের প্রতিনিধিদের মধ্যে এই সচেতনতা বাড়ে যে ক্ষমতা পেতে বা টিকিয়ে রাখতে হলে শুধুমাত্র নিজে/নিজের বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি প্রণয়ন বা রূপায়ণ করলেই চলবে না। ক্ষমতা ধরে রাখতে গেলে জনসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে যে গৃহীত নীতি সাধারণভাবে কাম্য এবং এই নীতি প্রণয়ন ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট যোগ্যতার অধিকারীরাই নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজনৈতিকভাবে এই প্রত্যয় গড়ে তোলা সম্ভব তখনই যখন এক বা একাধিক ব্যক্তি/গোষ্ঠী নিজের/নিজেদের ইচ্ছার দ্বারা অন্যদের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক যোগাযোগকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ারূপে গণ্য করতে হয় যার মাধ্যমে প্রেরক কোনও রাজনৈতিক তথ্য গ্রহীতার কাছে এমনভাবে পাঠায় যে তার ফলে গ্রহীতা অন্যথায় যে কাজ করতো না তা করতে বাধ্য হয়। রাজনৈতিক যোগাযোগের এরূপ বর্ণনায় তিনটি উপাদান লক্ষণীয় ঃ

(১) রাজনৈতিক তথ্য; (২) রাজনৈতিক তথ্য প্রেরণ বা বণ্টনের বিশেষ পদ্ধতি ও (৩) গ্রহীতাকে একটি বিশেষ আচরণ পালনে বাধ্য করানোর ইচ্ছা। উদাহরণস্বরূপ এমন এক কথা ভাবা যেতে পারে যেখানে উন্নয়নের অভাবে স্থানীয় জনগণ নির্বাচনে ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এক্ষেত্রে হয়তো দেখা গেল যে রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন বা স্থানীয় মানুষের দাবী ও অভিযোগ সরকারের কাছে তুলে ধরবেন। এ ধরনের প্রতিশ্রুতির ফলে এলাকার মানুষ তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে ভোট দিলেন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক যোগাযোগ সার্থকভাবে ঘটল বলা চলে।

রাজনৈতিক যোগাযোগের উদ্ভব ও বিকাশে আভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটের মতো আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের তাত্ত্বিক ও প্রক্রিয়াগত বিকাশের দুই বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে। আমাদের আলোচনার সীমিত পরিসরে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক যোগাযোগ সংক্রান্ত গবেষণায় নতুনভাবে আলোকসম্পাত করা হয়। লাস্ওয়েল তাঁর পূর্বোল্লিখিত গবেষণায় দেখিয়েছেন যে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson)-এর চোদ্দ দফা কর্মসূচী (Fourteen Points) উদ্ভাবনের সময় থেকেই মিত্রশক্তি জার্মানীর বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রচারভিত্তিক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু করে। অন্যদিকে জার্মানীও নিজের কায়দায় রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের স¥ে্মুখীন হয়ে জার্মান শাসকবর্গ একপেশে তথ্য প্রেরণের মাধ্যমে জনগণকে বোঝায় যে জার্মান যোদ্ধাদের যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষতার অভাবে এই পরাজয় আসেনি; এই পরাজয়ের কারণ মিত্রশক্তির মিথ্যা প্রচারে জার্মানীর বিভ্রান্তি।

আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একদিকে যেমন নাৎসী সম্প্রচার অব্যাহত থাকে অন্যদিকে ব্রিটিশ ও মার্কিনী গুপ্তচর সংগঠনগুলি ঐ সম্প্রচারের মধ্য দিয়ে নাৎসী সামরিক বাহিনীর গুপ্ত পরিচালনা সম্পর্কে হদিশ পাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। এভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক যোগাযোগ এক নতুন রূপ পায়। বিষয়টি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাক। আলেকজান্ডার জর্জ (Alexander George) তাঁর Propaganda Analysis গ্রন্থে দেখিয়েছেন, নিয়মিত নাৎসী সম্প্রচারে বর্ণিত জার্মান নেতাদের ক্রমানুসার, পূর্বতন ঘটনাসমূহের উল্লেখ, সম্প্রচারে বর্ণিত কোনও এক বিশেষ আদলের পরিবর্তে নয়া আদলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, প্রস্তুতি প্রবণতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কীভাবে জার্মানীর দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ হদিশ করা হত। রাজনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির বিশেষত্ব এখানেই যে এটি এমন এক পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যখন তথ্য আদানপ্রদানে মুক্ত প্রবাহ থাকে না। এক্ষেত্রে 'নিহিত অর্থ' খুঁজতে হয় এমন এক পরিস্থিতিতে যখন কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠী (এক্ষেত্রে নাৎসী) একদিকে যোগাযোগ রক্ষা করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে সীমাবদ্ধতার জন্য সহজ স্বাভাবিকভাবে তথ্য সম্প্রচারও সম্ভব হয় না।

শীতল যুদ্ধ (Cold War)-এর আমলে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত রাজনৈতিক যোগাযোগ পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন। যদিও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতির গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। কোনও রাষ্ট্রে শাসকবর্গ বিরোধীদের কাছে আপাত নিরীহ তথ্য আদানপ্রদান বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয় বা যখন রাজনীতিবিদগণ কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রকাশ্য তথ্য আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়েই 'নিহিত অর্থ' আদানপ্রদান করে। তখন এই পদ্ধতির বাস্তবায়িত হয়।

সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা

আভ্যন্তরীণ স্তরেই হোক বা আন্তর্জাতিক স্তরেই হোক রাজনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রমাণ করে যে ঐ প্রক্রিয়ার কোনও অতি সরলীকৃত সংজ্ঞার বিপদ অনেক। প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মূলে নিশ্চয় থাকে তথ্য আদানপ্রদান প্রক্রিয়া। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে রয়েছে নানা ধরনের জটিলতা। এই কারণেই যখন দুই রাজনীতিবিদ পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন, সেই আপাত সরল প্রক্রিয়ার মধ্যে চাপা থাকতে পারে নানা জটিলতা। ঐ প্রকাশ্য বিনিময়ের মধ্যেই থাকতে পরে নানা গুপ্ত সঙ্কেত।

এই বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, রাজনৈতিক যোগাযোগের অতি সরল সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে ঐ প্রক্রিয়ার জটিলতা ধরা পড়ে না। দু-একটি উদাহরণের মাধ্যমে বক্তব্যটি স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন উল্লেখ করা হল যে রাজনৈতিক যোগাযোগের অতিসরল সংজ্ঞার মধ্যে দিয়ে রাজনীতিবিদ্‌দের 'স্বাভাবিক সংলাপের' অন্তর্নিহিত সঙ্কেত ধরা পড়ে না। আবার কোনও মন্ত্রীর কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া ও সরকারের ওপর সেই কেলেঙ্কারির প্রভাবের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক যোগাযোগ তৈরী হয় তাও ধরা পড়ে না কোনও অতি সরল সংজ্ঞায়। আবার, কোনও এক জনসভায় এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা সম্পূর্ণ নীরব থেকেও তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে যে রাজনৈতিক যোগাযোগ ঘটাতে পারেন তাও ধরা পড়ে না কোনও অতি সরলীকৃত সংজ্ঞায়। আসলে সঙ্কীর্ণ অর্থে 'তথ্য'কে ব্যাখ্যা করলে, যে তথ্য এই নীরব রাজনীতিতে অশৃক্ত তা দৃষ্টির আড়ালে থেকে যাবে।

রাজনৈতিক যোগাযোগের সরলীকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিপজ্জনক বলেই অন্য একটি প্রবণতা সম্পর্কেও কিছু রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ববিদ সাবধানতা অবল¥¤ন করেন। এই প্রবণতা হল রাজনৈতিক যোগাযোগ ও প্রচারকে সমার্থক করে তোলা। রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বহু লক্ষ্যের একটি অবশ্যই প্রচার। এ বিষয়টি আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। কিন্তু এই লক্ষ্যকে 'একমাত্র' লক্ষ্য মনে করলে বিভ্রান্তি বাড়বে। যোগাযোগের অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ, আগ্রহ সৃষ্টি ও প্রণোদন (motivation)। এই লক্ষ্যগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করে রাজনৈতিক যোগাযোগকে 'প্রচার সর্বস্ব' করে তোলার অর্থ ঐ জটিল প্রক্রিয়ার সামগ্রিকতা বদলে অংশবিশেষে গুরুত্ব দেওয়া।

রাজনৈতিক যোগাযোগের মূল উপাদান রাজনৈতিক তথ্যের প্রসার (dissemination) ঘটে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। রাজনীতিবিদদের বক্তৃতা, নির্বাচনী ইস্তাহার (manifesto), সরকারি সিদ্ধান্ত বা জননীতি সংক্রান্ত বিতর্ক প্রভৃতি রাজনৈতিক তথ্য প্রসারিত হয় রাজনৈতিক দল, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, আইনসভা, দলীয় স¥েদ্মলন বা রেডিও টেলিভিশনের সম্প্রচার মাধ্যমে। তবে এই ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়া **সংস্থানগতভাবে** (structurally) রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশবিশেষ। এই প্রক্রিয়ার মূলে অবশ্য থাকে সেই প্রশ্নসমূহ যা লাসওয়েল রাজনীতি ও যোগাযোগের সম্পর্কের ভিত্তি বলে গণ্য করেন। কে কী মন্তব্য করেছে, কী ভাবে, কার উদ্দেশ্যে, কী ধরনের প্রভাবসহ? (Who says what, in what channel, to whom, with what effects?)

রাজনৈতিক যোগাযোগের এই প্রক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে আমরা কাঠামোগত প্রেক্ষিতের আলোচনায় যাব।

যোগাযোগ কাঠামো ঃ প্রকৃতি ও গুরুত্ব

আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে পাঁচটি কাঠামোর উল্লেখ করা যেতে পারে যার রাজনৈতিক তথ্য প্রসারের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে ঃ (১) অনানুষ্ঠানিক মুখোমুখি যোগাযোগ; (২) সাবেকি সামাজিক কাঠামো--যেমন পরিবার, ধর্মীয় গোষ্ঠী; (৩) রাজনৈতিক 'উৎপাদ' (output) কাঠামো--যেমন আইন বিভাগ ও আমলাতন্ত্র; (৪) রাজনৈতিক 'উপপাদ' (input) কাঠামো--যেমন, বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী; (৪) গণমাধ্যম।

অনানুষ্ঠানিক মুখোমুখি যোগাযোগের গুরুত্ব যে-কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই অনিবার্য। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের এই ধরণের কাঠামো কীভাবে উন্নতমানের যোগাযোগ প্রক্রিয়ার জন্ম দেয় তা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। ইলিহু কাজ্ ও পল লাজারসফেল্ড (Elihu Katz and Paul Lazarsfeld) Personal Influence নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন অধিকাংশ ব্যক্তির ওপরই এধরনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী বা প্রতিবেশীর মন্তব্য বা বিবৃতি মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সাধারণভাবে যেসব সমাজে আনুষ্ঠানিক কাঠামো দুর্বল যেসব ক্ষেত্রে এই ধরনের যোগাযোগই রাজনৈতিক

তথ্য আদানপ্রদান ও প্রত্যয় নির্মাণের একমাত্র পথ, তবে উন্নত আধুনিক সমাজেও এই ধরনের যোগাযোগের গুরুত্ব কিছু কম নয়। যদিও তা রাজনৈতিক যোগাযোগের একমাত্র ভিত্তি নয়। কাজ ও লাজারসফেল্ড দেখিয়েছেন যে কোনো ব্যক্তির রাজনৈতিক সচেতনতা ও মতামত অনেকাংশেই সৃষ্টি হয় কয়েকজন বিশেষ 'মতসৃষ্টিকারী নেতৃবৃন্দের' (Opinion leaders) মাধ্যমে যারা আমাদেরই "কাছের লোক"। ঐ বিশেষজ্ঞদ্বয়ের মতে, সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ও মিশুকে প্রকৃতির কারণেই তারা মতামত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

'আধুনিক' রাজনৈতিক ব্যবস্থায় **সাবেকি সামাজিক কাঠামোয়** গুরুত্ব অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা গেলেও এর প্রভাব প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট। যদিও সাবেকি সমাজে--যেমন আদিবাসী সমাজ--এই শ্রেণীর কাঠামোর উপস্থিতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী সমাজ 'প্রধান' বা সর্দার অথবা বয়োবৃদ্ধদের সংগঠন (council of elders) অথবা পরিবর্ধিত পরিবার বা ধর্মীয় নেতারা সমাজ বা জাতিগোষ্ঠীর কাছে তথ্য প্রদান বা ব্যাখ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধভিক্ষুদের ভূমিকাও প্রমাণ করে আদিবাসী বা প্রাচীন রাষ্ট্রে ধর্মীয় নেতাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে মৌলবিদের রাজনৈতিক ভূমিকা বা ফিলিপিন্‌সের মতো রাষ্ট্রে ক্যাথলিক যাজক ও আবেদি গোষ্ঠীর ভূমিকাও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। মনে রাখতে হবে, এই বিশেষ কাঠামো উদ্ভুত রাজনৈতিক যোগাযোগ জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে সাহায্যও করতে পারে বা বাধাও দিতে পারে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় **'উৎপাদ' কাঠামোর** ভূমিকাও অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে সরকারি সংগঠনের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয়। আমলাতন্ত্রের কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নীতি রূপায়ণের নানা নির্দেশ সংঘবদ্ধভাবে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে যায়। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই সরকার নামক 'সংগঠন' বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে ও সামাজিক সম্পদে সরলতা সৃষ্টি করে। নাগরিকদের সঙ্গে সরকারের 'জনসংযোগ'ও সম্ভব হয় ঐ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বিচারবিভাগেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। জনগণের নানা অভিযোগের নিষ্পত্তি করে এই বিভাগ সরকার সম্পর্কে জনমনে বৈধতা তৈরি করে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি সংগঠনগুলি জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ তথ্যও (general information) প্রদান করে। অন্যদিকে বিশেষ তথ্য ছাড়াও নানা ধরনের খবর (news releases) প্রকাশ্যে এনে সরকারি সংগঠনগুলি গণমাধ্যমের তথ্য আহরণের বড় সূত্র হিসেবে কাজ করে।

রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার **'উপপাদ'** (input) **কাঠামোর মধ্যে** রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকাই প্রধান। প্রকৃতিগতভাবে এই ধরনের সংগঠন জনসাধারণের নানা দাবী/অভিযোগ ও স্বার্থের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিচিতি ঘটায়, যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল ও এই ধরনের গোষ্ঠী সরকারি বিরোধিতার স¥œÅখীন না হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেখানে এরা সাধারণ নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরের মধ্যে প্রয়োজনীয় অথচ বিরল সংযোগ ঘটাতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে নেতৃবৃন্দের নানাবিধ কাজকর্ম সম্পর্কেও জনগণকে অবহিত করা আবার রাজনৈতিক দল ও সঙ্ঘবদ্ধ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীসমূহ জনগণের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করে নিজস্ব মতাদর্শ বা কর্মসূচী সমর্থন আদায় করে। এর মধ্যে দিয়ে জনগণের সচেতনতা ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি হয়।

বিংশ শতাব্দীর শেষে ও একাবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে রাজনৈতিক যোগাযোগের যে বিশেষ কাঠামো প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠছে তা **গণমাধ্যম**। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা, বই, সিনেমা গণমাধ্যমেরই বিভিন্ন রূপ। আলোচ্য কাঠামোগুলির মধ্যে গণমাধ্যমই হল বিশেষীকরণ (specialization) ও পৃথকীকরণের (differentiation) সার্থকতম উদাহরণ। এই কাঠামোর অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার ওপর। যথোপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্য পেলে গণমাধ্যম নানা বাধা এড়িয়ে বহু মানুষের কাছে তথ্য/বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম। ঐ কারণেই গণমাধ্যমের ব্যাপ্তি (mileage)-এর সঙ্গে অন্য কোনও মাধ্যমের তুলনা হয় না। সদিচ্ছা থাকলে শক্তিশালী গণমাধ্যমের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনসাধারণের মধ্যে নানা বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা বাড়াতে পারেন। গণমাধ্যমের মধ্য দিয়েই জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী নির্ধারণ করা যায়। একইভাবে গণমাধ্যমের সাহায্যে তথ্য আদানপ্রদান হলে অবহিত (informed) জনগণ (public) নানাবিধ রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করতে পারে, এমনকি রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। ওয়াকিবহাল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রয়োজনবোধে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও দেশবাসীকে পরিবর্তনের প্রয়োজন সম্পর্কে উৎসাহিত করতে গণমাধ্যমকে কাজে লাগাতে পারে। সুতরাং শাসকই হোক বা সাধারণ নাগরিকই হোক, প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক যোগাযোগের সুযোগ করে দিয়ে গণমাধ্যম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা পালন করার ক্ষমতা রাখে। এই কারণেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুক্ত রাজনৈতিক পরিমণ্ডল রক্ষা করতে মুক্ত গণমাধ্যমের ভূমিকাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমান যুগকে বলা হয় গণমাধ্যমের যুগ। গণমাধ্যমের এই বিস্তৃতির ফলে রাজনৈতিক যোগাযোগে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটছে তা আমরা পরবর্তী অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

এই সূত্রে বলা যায়, কোনও সমাজে বা রাষ্ট্রে উপরোক্ত কাঠামোসমূহ কতটা কার্যকরী হবে তা নির্ভর করবে ঐ সমাজ বা রাষ্ট্রে এই কাঠামোসমূহের স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের মাত্রার ওপর। স্বাভাবিকভাবেই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই কার্যকারিতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় অনেক কম হবে। শাসকমণ্ডলীর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাত্রা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে ঐ কাঠামোসমূহের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠবে। তবে একথাও ঠিক যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেও কোনও এক মাত্রায় তথ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন আমরা জানি যে নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নিরাপত্তাগত কারণে সেনসর (censor) প্রথা সব দেশেই চালু আছে। এক্ষেত্রেও পরোক্ষভাবে 'তথ্যই ক্ষমতা' এই ধারণাটির গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

যোগাযোগ প্রক্রিয়া ঃ রাজনৈতিক গতিশীলতা

অ্যামন্ড ও পাওয়েল (G. A. Almond and G. B. Powell) Comparative Politics গ্রন্থে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, ব্যবস্থা সক্ষমতা (system capability), নীতিপ্রণয়ন (rule formulation) ও স্বার্থ প্রত্যক্ষকরণ (interest articulation) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার রাজনৈতিক গতিশীলতা ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিকে চারভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয় ঃ (১) **সংরক্ষণ ও অভিযোজন ক্রিয়া ঃ রাজনৈতিক যোগাযোগ ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ** (Maintenance and Adaptation Function : Political Communication and Political Socializaiton); (২) **ব্যবস্থার সক্ষমতা ঃ**

যোগাযোগের প্রসার ও সামাজিক সচলতা (system capabilities : Expansion and Social Moblization); (৩) **রূপান্তর ক্রিয়া ১ ঃ রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নীতি প্রণয়ন** (Conversion Functions : Pol. Communication and Rule Making); (৪) **রূপান্তর ক্রিয়া ২ ঃ রাজনৈতিক যোগাযোগ ও স্বার্থপ্রত্যক্ষকরণ** (Conversion Functions : Political Communication and Interest Articulation)। নীচে এই চারটি বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হল।

আলোচনার পূর্ব সূত্র ধরে বলা যায় পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা চার্চ ইত্যাদির মতো ধর্মীয় সংগঠনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিবর্গের রাজনীতি/রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা গড়ে ওঠে। এর মধ্যে দিয়ে যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া চলে তা কোনও ব্যক্তিকে কোনও একটি বিশেষ বিষয় সম্পর্কে পরিচিত করে তুলতে পারে আবার কোনও একটি ধারণা ভেঙে নতুন ধারণার জন্ম দিতে পারে। এই ধরনের যোগাযোগ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া পশ্চিমি আধুনিক সমাজের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সরল কারণ ঐ দেশগুলিতে কিছু ক্ষেত্র (যেমন ঃ উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের মধ্যে শ্রেণীবিভাজন) ব্যতীত তথ্যপ্রবাহ সাধারণভাবে সমজাতীয়। এই প্রক্রিয়া অনেক জটিল আকার ধারণ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যেখানে তথ্যপ্রবাহের বৈচিত্র্য অনেক বেশি। তবে যে-কোনও পরিস্থিতিতেই জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের এই ভূমিকার সঙ্গে মতসৃষ্টিকারী নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীরও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এই যোগাযোগ সামাজিকীকরণের ‘ভাঙাগড়ার খেলা’ই নির্ধারণ করে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ বা অভিযোজনের মাত্রা।

ব্যবস্থার সক্ষমতা

কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাই আধুনিক যুগে ‘তথ্য বিস্ফোরণের’ (Info-explosion) হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না। এর সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য দাবী ও চাহিদা যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটার সঙ্গেই সমাজের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠী, আঞ্চলিক গোষ্ঠী, প্রভৃতি নিজস্ব চাহিদা প্রেরণে সচেতন ও সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রে এই প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি কারণ এই দেশগুলির সাবেকিয়ানা (traditionalism) ও খণ্ডীকরণ (fragmentation) দূর করে প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সচলতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়।

আসলে সামাজিক সচলতা অনেকাংশেই যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার ফল। নগরায়ণ, সাক্ষরতা, প্রাচীন প্রথা—সম্পর্ক-বিশ্বাস-রীতিনীতির ধর্মীয় শাসন মুক্ত করা, কর্মসংস্থান—এ সবই জড়িয়ে আছে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার সঙ্গে। এই ধরনের সচলতা যেমন একদিকে কাম্য, অন্যদিকে এর মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সক্ষমতাও পরীক্ষিত হয়। যদি নানা দাবী ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সামাজিক সচলতার মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে অনেক সময় এমন আকার নেয় যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তা সামাল দিতে পারে না; এক্ষেত্রে নানা অস্থিরতা ও অসন্তোষ সমাজে দেখা দেবে যার মধ্যে দিয়ে ঐ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বড় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হতে পারে। সমাজতত্ত্ববিদরা যাকে “ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপ্লব” (revolution of rising

expectations) বলেছেন তা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এভাবে এক উভয় সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দেয়।

রূপান্তর ক্রিয়া

নীতি প্রণয়ন নির্ভর করে সিদ্ধান্তের ওপর। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আবার প্রয়োজন নির্ভুল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন নীতি প্রণয়ন করবেন তখন স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ, জনসাধারণের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী, প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্যাদি তাদের কাছে থাকা জরুরি। তবে, তথ্য সরবরাহে সীমাবদ্ধতা ও বিকৃতির সম্ভাবনাও থেকে যায়। নানাবিধ কারণে তা ঘটতে পারে। প্রথমত ঃ একটি নির্দিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুধু একটি নির্দিষ্ট মাত্রাতেই তথ্য ব্যবহার (process) করতে পারে। দ্বিতীয়ত ঃ ব্যক্তিগত ইচ্ছা, আবেগ ও প্রবণতা ও অনেকক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রভাবে তথ্যের বিকৃতি ঘটতে পারে। বিশেষ করে যে ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা উচ্চপর্যায়ের কেন্দ্রীভূত সেসব ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা ও বিকৃতির সম্ভাবনা বেশি। অন্যদিকে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে সেক্ষেত্রে এই ধরনের বিচ্যুতির সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম।

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটলে সামান্য সংখ্যক শাসক ও উচ্চপদস্থ আমলার পক্ষে রাষ্ট্রের অজস্র দায়িত্ব সংক্রান্ত অসংখ্য তথ্য মনে রাখা ও সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃবর্গের ক্ষমতা সম্পর্কে জনগণের শ্রদ্ধা থাকলেও কারও পক্ষেই সামরিক প্রযুক্তি, রাজনৈতিক কৌশল, মুদ্রাস্ফীতি, পরিবহন, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, শিল্পায়ন প্রভৃতি ভিন্ন চরিত্রের বিষয় সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যের ওপর নিজের দখল রাখা অসম্ভব। অন্যদিকে, বর্তমান যুগে বহু তথ্যের (technical) প্রকৃতির কারণে নেতৃবৃন্দের কাছে দুর্বোধ্য থেকে যায়। এ ছাড়াও আছে শাসক ও প্রশাসকদের নানা ধরনের অযৌক্তিক কাজকর্ম যা তথ্যবিকৃতিতে সাহায্য করে।

এলিট শাসকবর্গের ক্রিয়াকলাপ ও তার ফলান সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত পর্যায় তথ্য আদানপ্রদানের ভূমিকা আগেই আলোচিত হয়েছে। এই ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই “জনগণের আওয়াজ” (vox populi) স্পষ্টভাবে শাসকদের কাছে পৌঁছে যায়। তবে এই ধরনের যোগাযোগ বিন্যাসের অন্য একটি দিকও লক্ষ্যণীয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শাসকবর্গ এই জনসচেতনতা রুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। নানাভাবে এই কাজ করা যেতে পারে। প্রথমত ঃ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বহু ক্ষেত্রেই কার্যকারণগত সম্পর্কে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে শাসকগণ কোনও একটি নীতি গ্রহণের পেছনে প্রকৃত কারণ কী তা ব্যাখ্যা না করে সম্পূর্ণ অন্য কারণ তুলে ধরতে পারেন। দ্বিতীয়ত ঃ বর্তমান বিশেষীকরণের যুগে সরকারি কাজকর্ম বহু ক্ষেত্রে বিশেষীকৃত জ্ঞান কৌশলগত জটিলতার সঙ্গে জড়িত থাকে। এক্ষেত্রে কোনও সরকারি নীতি বা পদক্ষেপ মূল্যায়ন করাও সেই নাগরিকের পক্ষে সহজ হয় না। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ নাগরিকের কাছে সরকারি বাজেটের এই ধরনের দুর্বোধ্যতার কথা বলা যেতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে তথ্যের অভাবে যোগাযোগ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। তৃতীয়ত ঃ অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণ শাসনব্যবস্থা ও ঐ ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকার ফলে কোনও

আগ্রহ বা সক্রিয়তা দেখায় না। সাধারণত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও নাগরিকদের মধ্যে মানসিক ব্যবধান বেশি হলে এ ধরনের নিস্পৃহতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে স্বার্থ প্রত্যক্ষকরণের কোনও তাগিদও চোখে পড়ে না। তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে এই ধরনের পরিস্থিতি চোখে পড়ে।

প্রযুক্তি বিপ্লবের যুগে রাজনৈতিক যোগাযোগ কী ধরনের পরিবর্তন ঘটছে, এ অংশে সে বিষয়ে আলোচনা করব।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে প্রযুক্তি বিপ্লব। **পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গণমাধ্যম—বিশেষভাবে বৈদ্যুতিন** (electronic) গণমাধ্যম। বর্তমান জগতে রাজনৈতিক কর্মী (actors) ও সাধারণ নাগরিকের বহু ভূমিকা পালনে, বহু বিষয় অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে এবং সাধারণভাবে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিশ্বায়নের যুগে গণমাধ্যমের এই প্রসার সম্পূর্ণভাবে না হলেও বহুলাংশে পরিসর (space) ও সময়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে। এর কারণ বিশ্বায়নের মূলে বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্কের এমন তীব্র অগ্রগতি যার মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানসমূহের যোগসূত্রই সাধিত হয় না, স্থানীয় ঘটনা ও দূরবর্তী ঘটনা একে অন্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

এক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রশ্নই শুধু নয়, জাতীয় সত্তা ও সাংস্কৃতিক সত্তা বিশ্বসংস্কৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির প্রশ্নও জড়িত। যোগাযোগ প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের যোগসূত্র ও তার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। উপগ্রহ যোগাযোগের মাধ্যমে যেমন বিভিন্ন স্থানের মধ্যে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে এবং তার ফলে আমাদের সময় ও পরিসরের তাৎপর্য সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে, ভৌগোলিক ও সময়গত পার্থক্য সত্ত্বেও যেমন আমরা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সম্প্রচার ‘সরাসরি’ দেখি। বলা যেতে পারে, দূরবর্তী এলাকাগুলির মধ্যে নিকট সম্পর্ক স্থাপনে যা যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সম্ভব হচ্ছে, তা আন্তর্জাতিক স্তরে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলছে। গণমাধ্যমে এক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার ফলে রাজনৈতিক যোগাযোগের আলোচনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করা হয়েছে গণমাধ্যম-উদ্ভূত ঘটনা (Media event) ‘মিডিয়া ইভেন্ট’।

‘মিডিয়া ইভেন্ট’ বড় মাপের ঘটনা যা সাধারণভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ‘গ্রহীতা’দের জন্য গণমাধ্যম দ্বারা পরিকল্পিত ও রূপায়িত হয়ে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। **মিডিয়া ইভেন্ট**-এর **গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী** (symbolic), **রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য** ‘সাধারণ’ ঘটনা থেকে একে পৃথক করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ রাজপরিবারের বিবাহ অনুষ্ঠান (যেমন চার্লস-ডায়না বিবাহ), গুরুত্বপূর্ণ উদ্বোধন অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় সৎকার (যেমন রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রে) বা শান্তিচুক্তির স্বাক্ষর ইত্যাদি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। উন্নত প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের সাহায্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা সকলেই এই ধরনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে পারি। ডি হ্যালিন ও পি ম্যানচিনি (D. Hallin and P. Mancini)-এর মতো প্রথম সারির গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা মিডিয়া ইভেন্টের

গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেছেন, এই ঘটনাগুলি সামাজিক ফারাক দূর করে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক স্তরে 'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। বিশেষজ্ঞরা যেমন দেখিয়েছেন, আশির দশকে যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত যুক্তরাজ্যের উচ্চতম পর্যায় অনুষ্ঠিত বৈঠকের গুরুত্ব যতটা না গৃহীত সিদ্ধান্তের কারণে ছিল তার থেকে অনেক বেশি ছিল যে মানবিকতার ভিত্তিতে ঐ বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য। ঐ বৈঠকগুলি সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণা জন্মায় যে রাজনৈতিক শত্রুতা দূর করে বন্ধুত্বের বাতাবরণ তৈরিতে দীর্ঘ দিনের শত্রুদ্বয় বদ্ধপরিকর। এর মধ্যে দিয়ে 'দর্শক'রা এই বৈঠকগুলির রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন যার মধ্যে দিয়ে আবার ঐ বৈঠকগুলি বৈধতা অর্জন করে। সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে ভারত-পাকিস্তানের বাস চলাচল (১৯৯৯) ও তার সরাসরি সম্প্রচার এই আলোকে দেখা যেতে পারে।

উচ্চমানের তথ্যপ্রযুক্তি এই ধরনের 'মিডিয়া ইভেন্ট'কে অনেক সহজে আন্তর্জাতিক রূপ দেয়। দূরবর্তী বিভিন্ন এলাকার বহু গ্রহীতা/নাগরিক এই 'ঘটনার' অংশগ্রহণ করে দর্শক হিসেবে পর্যবেক্ষক হিসেবে, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হিসেবে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রনীতির প্রচার ও বৈধকরণে এই বিপুলসংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ ব্যবহার করা হয়। কাজ ও দয়ান্ (E. Katz and D. Dayan) Media Events গ্রন্থে বলেন —"কোনও ঘটনার সরাসরি সম্প্রচার ঐ ঘটনার সাফল্যের বিষয়ে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে...এক্ষেত্রে ঐ ঘটনা শুধু সফল হলেই হবে না, এক বিশেষ সময়সীমার মধ্যে এই সাফল্য আসতে হবে।"

এক্ষেত্রে উল্লেখ উপরোক্ত গ্রন্থে লেখকদ্বয় 'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে জনমত, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কূটনীতি, পরিবার, ধর্ম, প্রভৃতি বিষয়ের ওপর এর প্রভাব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

অন্যদিকে, 'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর সমালোচনাও জোরালোভাবে হচ্ছে। রাজনৈতিক যোগাযোগের আলোচনায় সমালোচনার গুরুত্বও কম নয়। সমালোচকের বক্তব্যকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, গণমাধ্যম এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দেয়। এর ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর আধিপত্য কায়েম হয় ও বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব হারিয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তির অধিকারী ও নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রগুলিতে ঘটা ঘটনা বিশ্বজুড়ে যত সহজে যে মাত্রায় সম্প্রচারিত করা সম্ভব তা তুলনামূলকভাবে অনুন্নত প্রযুক্তির অধিকারী ও দুর্বল রাষ্ট্রের সীমানায় ঘটা ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, 'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর প্রবল প্রসার ও জনপ্রিয়তার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহ চাপা পড়ে যায়। যেমন অতীতে যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ বৈঠকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে এই দুই রাষ্ট্রে মতানৈক্যের বিষয়গুলি মতৈক্যের জোরদার প্রচারে চোখের আড়ালে চলে যায়।

'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর গুরুত্ব অলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞগণ এও মনে করেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে গ্রহীতাদের মধ্যে অন্যভাবে কল্পচিত্র (images) সম্প্রচার করেও নিজস্ব ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। 'অন্যভাবে' বলতে এখানে এমন এক সম্প্রচার পদ্ধতির কথা বলা হচ্ছে যেখানে কল্পচিত্র এক নিয়ন্ত্রিত যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিশেষ 'মোড়ক' (package)-এর অংশ হিসেবে উদ্ভূত হয় না। বরং এক্ষেত্রে কূটনৈতিক

প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে পারে এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে গণমাধ্যমকে দূরে রাখা হয়। গণমাধ্যমের উপস্থিতি মানে কোনও কূটনৈতিক বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের বিব্রতকর প্রশ্নের স¥œুখীন হওয়া বা বৈঠকে আলোচিত বিষয়ের, 'অন্যরকম' বিশ্লেষণ হওয়া বা বহিরাগতদের বিতর্কে জড়িয়ে ফেলা। এই ধারণা থেকেই জন্ম নেয় এই বিশ্বাস যে গণমাধ্যম অতিরিক্ত নজর কূটনীতির অস্তিত্ব বিপন্ন করে। একারণেই অনেক কূটনৈতিক প্রক্রিয়া গণমাধ্যমের চোখের আড়ালে 'গোপনীয়তা' রক্ষা করে সংঘটিত হয়। তবে, এর ফলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। তথ্যবিপ্লবের যুগে একথা সর্বজনবিদিত যে রাজনৈতিক কর্মী ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষায় গণমাধ্যমের ভূমিকা ক্রমাগত বাড়ছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেও গণমাধ্যমের ভূমিকা সামান্য নয়। অবশ্য দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও নাটকীয় পরিবর্তনের বদলে গণমাধ্যমের কাজ হয় নানা তথ্যকে দৃষ্টিগোচরে আনা, নতুন তথ্য সরবরাহ করা। জনমতকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের পক্ষে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

রাজনৈতিক যোগাযোগের আলোচনা থেকে এ বিষয় স্পষ্ট যে এই প্রক্রিয়ার নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এর গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য এই গুরুত্ব বৃদ্ধির নেতিবাচক দিকও আছে। তবে গণমাধ্যমের প্রবল উত্থানের যুগে নাগরিক একদিকে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও অন্যদিকে গণমাধ্যমের 'লক্ষ্য' হয়ে উঠেছে। দু'পক্ষেরই দাবী তারাই জনগণ। নাগরিকের স্বার্থে কাজ করে। যদিও বাস্তব চিত্র এই যে দু'পক্ষেই নিজেদের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট, বহুক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার দাবী এতই জোরালো হয়ে ওঠে যে জনগণের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সয়ানসন (D. Swanson)-এর মতো বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মতো "দ্বিতীয় গণমাধ্যম-কেন্দ্রিক গণতন্ত্র"ও অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিককে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রকৃত অংশগ্রহণকারী হিসেবে না দেখে 'দর্শক' হিসেবেই গণ্য করা হয়। এই সমস্যার সমাধান তখন সম্ভব যখন জনসাধারণ রাজনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্ব বুঝে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও গণমাধ্যমেরও ব্যবহার করে নিজেদের উপস্থিতি ও সক্ষমতা (capability) বাড়াতে ব্যবহার করবে। সাধারণ নাগরিকের সক্রিয় ভূমিকা বাস্তবায়িত হলে রাজনৈতিক যোগাযোগের পরিধি আরও বিস্তৃত হবে।

অতি সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। রাজনৈতিক যোগাযোগের মূল উদ্দেশ্য কী?

২। রাজনৈতিক যোগাযোগ সম্পর্কে হ্যারল্ড লাসওয়েলের বক্তব্য জানান।

স্বল্প পরিসরে উত্তর দিন ঃ

১। রাজনৈতিক যোগাযোগের সর্বস¥œত সংজ্ঞা নেই কেন?

২। 'মিডিয়া ইভেন্ট'-এর অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

বিশদভাবে উত্তর দিন ঃ

১। রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার উদ্ভব ও বিকাশ ব্যাখ্যা করুন।

২। রাজনৈতিক যোগাযোগ কাঠামোর প্রকৃতি ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

১। G. A. Almond and G. B. Powell : Comparative Politics (New Delhi), 1972, পরিচ্ছেদ ঃ "Communicative Function".

২। Michael Rush : Politics and Society (New York), 1992 পরিচ্ছেদ ঃ "Political Communication".

৩। David L. Shills ed. International Encyclopaedia of Social Science, Volumes 3+4, 1972, pp. 90-102.